মুসলিমবিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী

অনুবাদ : কাজী একরাম

নাশাত

মুসলিমবিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী
অনুবাদ : কাজী একরাম

প্রকাশকাল : মে ২০২৪

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
০১৭১২২৯৮৯৪১, ০১৮৪১৫৬৪৬৭১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানান : তালহা মুহাম্মদ

মূল্য : ২৮০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ

রাশেদ ইমতিয়াজ

ভাই ও বন্ধু

অনুবাদকের কথা

আলেম ও চিন্তাবিদদের মধ্যে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী একটি বিশিষ্ট নাম। অ্যাকাডেমিক এবং বুদ্ধিজীবীমহলে তার নতুন করে পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। এ যাবৎ তার বহু বিপ্লবী রচনাকর্ম জনসমক্ষে এসেছে এবং জ্ঞানজাগতিক দুনিয়ায় সমাদৃত ও স্বীকৃত হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি মাস্টারপিস। গ্রন্থটি বর্তমান জমানার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ—পশ্চিমা সভ্যতার সর্বৈব অনুকরণ তথা পশ্চিমীকরণ (westernization) এবং আধুনিকতাবাদকে (modernism) ব্যবচ্ছেদ করেছে এবং এটাও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, ইসলামি দুনিয়া কীভাবে পশ্চিমাকরণকে গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন ইসলামি দেশ এ বিষয়ে কী অবস্থান নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইসলামি বিশ্বের জন্য সঠিক পথ কী। এভাবে, আধুনিকতার পথে কে কীভাবে ধাবিত ও অগ্রসর হয়েছে এবং ইসলামি বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসের নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাতের' বৃত্তান্ত এবং ইসলামি পুনরুজ্জীবনে উদ্ভূত আধুনিক আন্দোলনসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে এই গ্রন্থ।

গ্রন্থকার তুরস্কের ইতিহাস অধ্যয়ন করে বুঝতে পারেন যে, পশ্চিমের প্রতি সম্মোহন এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বাত্মক অধিগ্রহণের এই ব্যাধি তুরস্কের সাথেই সম্পৃক্ত নয়, সমগ্র ইসলামি বিশ্ব এর অভিঘাতে আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত, তখন তিনি এর উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এরপর লন্ডন সফরকালে স্বচক্ষে সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব ও সম্মোহন খুব কাছ থেকে অবলোকন করেন। এ পর্যায়ে তিনি আরও সচেতন হয়ে ওঠেন এবং তার সংবেদনশীল মনে এই প্রতীতি জাগে যে, এই দিকে মনোযোগ দেওয়া খুবই প্রয়োজন এবং ইসলামি বিশ্বকে গাইড করা এবং পরামর্শ দেওয়া আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে তিনি একটি বাকবিদগ্ধ বক্তৃতাও পেশ করেন, যা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয় এবং আরবদুনিয়ায় এই মহান হিন্দুস্থানি স্কলারের এই উক্তি মশহুর হয়ে ওঠে : الشرق شرق و الغرب غرب، و بينهما برزخ لا يلتقيان অর্থাৎ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্বভাব ও মন-মেজাজে একটি ব্যবধানের প্রাচীর রয়েছে, দুটি কখনোই মিশে যেতে পারে না।' তিনি 'আস-সিরা' বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ফিকরাতিল গারবিয়্যাহ ফিল আকতারিল ইসলামিয়্যাহ'র মতো চিন্তা-উদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করেন, যার প্রসারিত, সংশোধিত এবং পরিণত উর্দু সংস্করণ হল 'মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যত অওর মাগরিবিয়্যত কি কাশমাকাশ' এবং বাংলা সংস্করণ 'মুসলিমবিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত', যা এক্ষণে আপনার হাতে শোভা পাচ্ছে।

মুসলিমবিশ্বে পাশ্চাত্যায়নের বিস্তার এবং প্রাচ্য-দুনিয়ায় আধুনিকতার উত্থান ইত্যাদি বিষয়ে বোঝাপড়ার জন্য এটি একটি চমৎকার বই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত সেরা উপকরণ এতে মজুদ রয়েছে। বইটিতে ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও উর্দু উৎসের প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার উপলব্ধি ও পাশ্চাত্যায়নের মোকাবেলায় এর গুরুত্ব বিবেচনায় বইটি বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপকভাবে অনূদিত ও পঠিত হয়েছে। তাই, আমরাও যথাযোগ্য অনুবাদে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে বইটি হাজির করার চেষ্টা করেছি।

প্রাক-কথন

বর্তমানে, প্রায় সব মুসলিম দেশেই একটি মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আরও সঠিক শব্দে, একটি মানসিক যুদ্ধ জারি আছে, যাকে আমরা ইসলামি চিন্তা ও মূল্যবোধ এবং পাশ্চাত্য চিন্তা ও মূল্যবোধের সংঘাত বা যুদ্ধ হিসেবে ব্যক্ত করতে পারি। এসব দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ইসলামের প্রতি মুসলিম জাতিগুলোর হৃদয়াবেগ ও ভালোবাসা এবং যে নামে স্বাধীনতার যুদ্ধ হয়েছে ও জয়লাভ করেছে বা যে শক্তিতে এসব দেশের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়েছে, সবই দাবি করে যে, এইসব ভূখণ্ডে শুধুমাত্র ইসলামি চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধেরই অধিকার রয়েছে এবং এখানে শুধুমাত্র সেই জীবনাদর্শের অনুসরণ করা বিধিত, ইসলাম যে জীবনাদর্শের আহ্বান করে।

কিন্তু এর বিপরীতে, এই মুহূর্তে যে শ্রেণির হাতে এসব দেশের ক্ষমতা, তাদের মানসিক গঠন, শিক্ষা-দীক্ষা এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থের দাবি হল এসব দেশে পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের বিকাশ এবং এই দেশগুলোকে পশ্চিমা দেশগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করানো; এবং ধর্মীয় ধারণা, জাতীয় রীতিনীতি, জীবনবিধান এবং আইন ও ঐতিহ্য যা কিছুই তাদের এই দাবিপূরণে প্রতিরোধক ও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে, তাতে সংশোধনী আনতে হবে কিংবা তা বাতিল করা হবে। সংক্ষেপে, দেশ ও সমাজকে অতি সন্তর্পণে, অথচ দৃঢ় সংকল্পের সাথে 'পাশ্চাত্যায়ন'-এর ছাঁচে অভিযোজিত করা হবে। এই ক্ষেত্রে, কিছু দেশ এই যাত্রার একাধিক মনজিল ইতোমধ্যেই পার করে ফেলেছে, এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে প্রায় উপনীত হয়ে গেছে। আর কিছু দেশ এখনও 'ক্রসরোডে' রয়েছে; কিন্তু তাবৎ লক্ষণ ও সাক্ষ্য স্পষ্টভাবে সেই গন্তব্যমুখিতাই নির্দেশ করছে!

আমার মতে, এটিই এই সময়ে মুসলিম দেশগুলোর সবচেয়ে বড় ও বাস্তবিক সমস্যা, ধারণাপ্রসূত বা কল্পনানির্ভর নয় মোটেই। মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব ও আগ্রাসন, (যার নজির মানবসভ্যতার ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যাবে) দেশগুলোর বৈষয়িক ও রাজনৈতিক শক্তি সকল মুসলিম দেশের সামনে এ বিষয়টি অত্যন্ত জ্বলজ্বলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে উত্থাপন করেছে, যার উত্তর সবাইকে দিতে হবে এবং এই সংকেত ও অগ্রসর হওয়ার অনুমোদন ছাড়া কোনো দেশের যানবাহন এগিয়ে যেতে পারে না। পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি এই দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে এবং তাদের সমাজকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং যুগের বিরাজমান চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে তারা কোন পথ অবলম্বন করে এবং এক্ষেত্রে কতটা বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার প্রমাণ দিতে পারে- এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করে পৃথিবীর মানচিত্রে এসব জাতির গতিমুখ কী হবে এবং এসব দেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ কীরূপ হবে এবং তারা এই যুগে ইসলামের সর্বজনীন ও চিরন্তন পয়গামের জন্য কতদূর উপযোগী সাব্যস্ত হতে পারে।

দীর্ঘকাল ধরে এই সমস্যার জ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করার এবং অদ্যাবধি এ বিষয়ে যত কাজ হয়েছে, তা একজন নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ ও একজন বাস্তববাদী চিন্তাবিদের দৃষ্টিতে দেখার এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ করার জরুরত অনুভূত হয়ে আসছিল। একইসাথে এই প্রচেষ্টায় এটাও হওয়ার দরকার যে, ইসলামি সমাজের পক্ষে উন্নতি এবং গতিশীল জীবনপ্রবাহের সাথে চলার সঠিক ও ভারসাম্যময় পথ কী। আজ সকল মুসলিম দেশ বিশেষ করে সদ্যস্বাধীন ইসলামি দেশগুলোর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই আন্তরিক উপদেশ ও পথনির্দেশের। এই ক্ষেত্রে সামান্য ভুল এবং কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি তাদেরকে যত্রতত্র নিক্ষেপ করতে পারে!

লেখক এই চেতনাবোধ থেকে, গত বছর আরবি ভাষায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনার কাজ শুরু করেছিলেন, যা শীঘ্রই একটি গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রন্থটি শাবান ১৩৮২ হিজরিতে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩), موقف العالم الاسلامی تجاه الحضارة الغربية (পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইসলামি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান) শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং আরবদেশগুলির অ্যাকাডেমিক এবং ধর্মীয় মহলগুলিতে মনোযোগ ও উৎসাহের সাথে পঠিত হয়েছে। লেখককে উৎসাহিত ও আশান্বিত করেছেন অনেক চিন্তাশীল মানুষ। পরবর্তীতে লেখকের অনুরোধে 'আল-বা'স আল-ইসলামী'র সম্পাদক মুহাম্মদ আল-হাসানী রচনাটি উর্দুতে রূপান্তর করেন। যখন অনুবাদটি সংশোধন ও সম্পাদনা করতে বসি, বেশ কিছু জায়গায় সংযোজন এবং বিশদ বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এরই মধ্যে, সমস্যা ও সংকটের কিছু নতুন দিকও সামনে আসে এবং কিছু নতুন তথ্য-উপাত্ত হস্তগত হয়, তাই জায়গায় জায়গায় সংযোজন করতে হয় এবং কোথাও কোথাও পরিবর্তন ও পরিমার্জনও। এর ফলে, অনুবাদের পর বইটির কলেবর প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর অ্যাকাডেমিক মূল্য ও উপযোগিতাও সমহারে বৃদ্ধি পায়।

এই সময় ইউরোপে ভ্রমণ হয় আমার, ফলে এই সভ্যতাকে এর মূল কেন্দ্রগুলিতে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়। পাশাপাশি এই আধুনিক জ্ঞানকেন্দ্রগুলিতে হস্তগত হয় নতুন কিছু প্রকাশনা এবং উৎস-সূত্র, যেগুলো থেকে সহায়তা নেওয়া হয়। এখন এই সমস্ত সংযোজন ও সংশোধনীসহ, বইটি 'মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়্যত অওর মাগরিবিয়্যত কি কাশমাকাশ' (মুসলিমবিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত) নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আরবি সংস্করণটি যেমন আরবদেশগুলিতে মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে পঠিত হয়েছে, এটিও অনুরূপ মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে পঠিত হবে বলে আশা করি।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি আমাদের ইসলামি দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের এই গুরুতর ও মহান দায়িত্ব বোঝার এবং সঠিকভাবে পালন করার তাওফিক দান করেন।

আবুল হাসান আলী নদবী
লন্ডন, ২৪ অক্টোবর ১৯৬৩

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! লেখকের 'মুসলিমবিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত' শীর্ষক বইটির তৃতীয় সংস্করণের সময় এসেছে। প্রত্যেক লেখকের মতোই এই গ্রন্থকারের হৃদয়ও বইটির প্রকাশনা ও গ্রহণীয়তায় স্বভাবতই আনন্দিত এবং মহান মালিকের কৃতজ্ঞতায় অভিসিক্ত। প্রত্যেক লেখকের কাছে তার প্রতিটি রচনা গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি বলে মনে হয়, তথাপি বলতে পারি যে, লেখকের দৃষ্টিতে এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, চিন্তা-উদ্দীপক এবং অভিনিবেশ-যোগ্য। কারণ এটি এমন একটি সমস্যার উপর রচিত, যা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুতর এবং জটিল সমস্যা। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখা ছিল, 'আমার কাছে, এটাই এই মুহূর্তে মুসলিম দেশগুলির সবচেয়ে বড় এবং বাস্তব সমস্যা এবং এই প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধানের উপর (যে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি এই দেশগুলি কী মনোভাব ও অবস্থান গ্রহণ করে এবং নিজেদের সমাজকে বর্তমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করতে ও সময়ের আধিপত্যশীল চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কোন পথ অবলম্বন করে এবং তারা এতে কতটুকু বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে) নির্ভর করে বিশ্বের মানচিত্রে এই জাতিগুলোর অবস্থান কী হবে এবং এই দেশগুলিতে ইসলামের ভবিষ্যৎ কেমন হবে?' লেখকের অন্যান্য রচনার মতো, যার মধ্যে কয়েকটির দশ বা দশেরও অধিক সংস্করণ বের হয়েছে, এ বইটিরও এই সময়ের মধ্যে অন্তত তিন সংস্করণের অধিক আসতে পারত, কিন্তু এ বইটির এই বিশিষ্টতা রয়েছে যে, প্রতিটি সংস্করণের সময় এটি সংশোধন করা এবং এই বইয়ে উল্লিখিত দেশগুলির পরিবর্তনগুলির খোঁজ-খবর নেওয়া ও পর্যালোচনা করার দরকার পড়েছে। কারণ, এইসব দেশ এখনও তাদের যাত্রাপথে রয়েছে। পরিবর্তন এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে জারি রয়েছে। তাদের ভেতর নতুন আন্দোলন ও প্রচেষ্টা এবং শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক Factor কাজ করে চলেছে। এদিকে লেখকের ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততা এবং দায়িত্বের কারণে এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করা সহজ ছিল না। এই সময়ের মধ্যে মিসর, ইয়েমেন, লিবিয়া, আলজেরিয়া, আফগানিস্তানে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং পাকিস্তান ও ইরানে মৌলিক পরিবর্তন ও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এসব পরিবর্তনের উল্লেখ না করেই যদি বইটি প্রকাশিত হত, তবে তা আউট অব ডেট বা সময়োপযোগী নয় বলে বিবেচিত হত এবং সচেতন পাঠকগণ তাতে কমতি এবং শূন্যতা অনুভব করতেন।

লেখক এসব পরিবর্তন ও বিপ্লবের একটি সংবেদনশীল এবং বাস্তবসম্মত পর্যালোচনার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আর তাতেই বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশে ঢের বিলম্ব হয়ে যায়। শেষমেশ এই কাজটি অর্পণ করতে হয়েছে কতিপয় সুহৃদ সহযোগীর কাছে, যারা তাদের অধ্যয়নে সতেজ এবং এই দেশগুলোর সাথে যাদের অবগতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং

প্রত্যক্ষজাত। তারা এই পরিবর্তমান দেশগুলির উপর নোট তৈরি করেন এবং আমি সেগুলি অধ্যয়ন করে গ্রন্থভুক্ত করি।[১] এখন বলা যায় বইটি এই দেশগুলো সম্পর্কে হালনাগাদ (Update) হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বইটির কতিপয় আরবি ও ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। আশা করি, আগের সংস্করণের ন্যায় আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে পঠিত হবে বইটি এবং যে উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

আবুল হাসান আলী
দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, লখনৌ
৬ সফর ১৪০১
১৫ ডিসেম্বর ১৯৮০

[১] এই কাজে যুক্ত ছিলেন 'আল-বাসুল ইসলামী'র সম্পাদক সাইয়েদ মুহাম্মদ আল-হাসানী এবং 'আর-রাইদ' সম্পাদক মৌলবী সাইয়েদ মুহাম্মদ রাবে হাসানী নদবী ও মৌলবী সাইয়েদ মুহাম্মদ ওয়াজেহ হাসানী নদবী।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

গ্রন্থকার এই মর্মে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছেন যে, তিনি 'মুসলিমবিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের সংঘাত' বইটিতে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ আসতে যাচ্ছে। প্রথমে বইটি আরবি ভাষায়—"আস-সিরা' বাইনাল ফিকরাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ফিকরাতিল গারবিয়্যাহ ফিল আকতারিল ইসলামিয়্যাহ" নামে কুয়েতের 'দারুল-কলম' থেকে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, যার তৃতীয় সংস্করণও উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মুদ্রণের অসুবিধা এবং প্রকাশনার ধীরগতির কারণে উর্দু সংস্করণ সবসময় আরবি থেকে পিছিয়ে থাকে, অন্যথায় এই সময়ের মধ্যে উর্দুরও বেশ কয়েকটি সংস্করণ আসা উচিত ছিল। শেষ আরবি সংস্করণে যেসব সংযোজন হয়েছিল, তা-সমেত আরও কিছু নতুন সংযোজন এখন এই নতুন উর্দু সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে এ সংস্করণটি হয়ে উঠেছে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম উর্দু সংস্করণের তুলনায় আরও বেশি উপযোগী, নির্ভুল এবং আপডেট। বইয়ের শেষান্তে 'শেষকথা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ যোগ করা হয়েছে, যা এ বইটির পুরো চেতনা এবং সারমর্ম ধারণ করে।

একই সময়ে বইটির ইংরেজি অনুবাদও Western Civilisation: Islam And Muslims নামে প্রকাশিত হয় এবং অভিজাত ইংরেজি-জানা-মহলে অত্যন্ত আগ্রহ ও মূল্যায়নের সাথে পঠিত হয়। চিন্তাশীল মহলের অনেকেই এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে আত্মচেতনা তৈরি এবং তাদের ব্যক্তিত্ব উন্নীত করার যে-সিলসিলা শুরু হয়েছিল 'মা-যা-খাসিরাল আলম বি-ইনহিতাতিল মুসলিমিন' এবং 'ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানোকে উরূজ ওয়া যাওয়াল কা আছর'-এর মধ্য দিয়ে, এ বইটি দ্বারা তারই পূর্ণতা সম্পাদন হয়েছে। এইভাবে গ্রন্থদ্বয় যেন একই বৃন্তের দুই পাপড়ি! প্রথম গ্রন্থটি আল্লামা ইকবালের এই স্তবকের উপর শেষ হয়েছিল :

معمار حرم باز بہ تعمیر جہاں خیز

হে হেরেমের স্থপতি, ফের গড় এ বিধ্বস্ত পৃথিবী।

এখন এই বর্তমান গ্রন্থে বলা হয়েছে বিশ্বের পুনর্গঠনে কোন কোন বাস্তবতা বিবেচনায় রাখতে হবে এবং কোন কোন দিকগুলো আমলে নিতে হবে এবং এই কাজটি স্বয়ং তাদের নিজদের দেশগুলোতে, যারা হেরেমের প্রাচীরের ছায়ায় অবস্থান করছে, কতটা জটিল এবং কতটা জরুরি হয়ে উঠেছে! এই কাজের মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা যদি সামান্যও তাদের উপলব্ধ হয় তাহলেই গ্রন্থকারের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় এবং প্রচেষ্টা বিফলে যায় না।

আবুল হাসান আলী নদবী
রায়বেরেলী
১৯ রবিউস সানী ১৩৯০ মোতাবেক ২৪ জুন ১৯৭০

সূচিপত্র

পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি কিছু মুসলিম দেশের নেতিবাচক কিংবা নিরপেক্ষ মনোভাব ::
ইসলামি দুনিয়া পশ্চিমা সভ্যতার পরাক্রমের কবলে :: ১৯
মিশ্র সভ্যতা :: ১৯
নেতিবাচক মনোভাব ও অবস্থান :: ২০
এই অবস্থানের প্রাকৃতিক ও শরয়ি বিচার এবং এর পরিণতি :: ২০
বিচ্ছিন্নতার পরিণতি :: ২২
নিরেট সামাজিক ঐতিহ্য এবং দেশীয় সংস্কার একটি নবপ্রাণ সভ্যতার মোকাবেলা করতে পারে না :: ২৬
প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং প্রাজ্ঞ পদক্ষেপ :: ২৭
ইসলামি বিশ্বে সংঘটিত বিপ্লব ও বিদ্রোহসমূহের আসল কারণ :: ৩৮
ইসলামি বিশ্বে আধুনিকতা ও পশ্চিমায়ন আন্দোলন : এর সমর্থক ও সমালোচকগণ ::
দ্বিতীয় অবস্থান :: ৪৩
তুরস্ককে 'পশ্চিম' বানানোর প্রয়াস এবং এর কারণ :: ৪৩
জটিল এবং স্পর্শকাতর পর্যায় :: ৪৪
প্রাচীন ও আধুনিক দল :: ৪৫
জিয়া গোক আলপ এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি :: ৪৬
তুরস্কের অনুকরণমূলক ভূমিকা :: ৫০
নামিক কামাল :: ৫২
কামাল আতাতুর্কের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য :: ৫৩
কামাল আতাতুর্কের সংস্কার এবং তার বিপ্লবী পদক্ষেপ :: ৫৮
ইসলামি বিশ্বে আতাতুর্কের অসাধারণ জনপ্রিয়তা :: ৬০
ভারতবর্ষে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব :: ৬১
দীনি নেতৃত্ব ও দারুল উলুম দেওবন্দ :: ৬২
দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা আন্দোলন :: ৬৩
স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্ব ও তার চিন্তাধারা :: ৬৫
স্যার সৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বল দিক :: ৬৮
এই আন্দোলনের ফলাফল ও অবদান :: ৭০
আকবর এলাহাবাদী :: ৭১
জাতীয় সংগ্রাম এবং বিদেশি পণ্য বর্জন :: ৭১
ডক্টর ইকবাল এবং তার পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা :: ৭৩
প্রাচ্যের আধুনিকতাবাদীদের সম্পর্কে তার সমালোচনা :: ৭৯
ইসলামি সভ্যতা ও এর প্রাণশক্তিতে আস্থা :: ৮০
আধুনিক ইসলামি পরীক্ষাগার :: ৮০
ধর্মীয় দিকনির্দেশনার গুরুতর দায়িত্ব :: ৮৪

পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামি :: ৮৫
ইসলামি বিশ্বে মিসরের ভূমিকার গুরুত্ব :: ৮৬
একটি নতুন সুয়েজ খালের প্রয়োজনীয়তা :: ৮৭
অনুকরণের ক্ষেত্রে মিসরের দুর্বল দিক :: ৮৭
সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী :: ৮৮
মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু :: ৮৯
সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানীর আন্দোলন ও তার চিন্তাধারার প্রভাব :: ৯০
আরববিশ্বে পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রধান পথিকৃৎ :: ৯১
মিসরে নারীমুক্তি আন্দোলন এবং এর প্রভাব :: ৯৩
মিসরে প্রাচ্যবাদীদের কণ্ঠস্বর :: ৯৫
সংকলন ও অনুবাদ আন্দোলনের সাহিত্যমুখিনতা এবং মৌলিক কাজের অভাব :: ৯৬
পাশ্চাত্য জীবনের একটি ছবি :: ৯৭
মিসরকে ইউরোপের টুকরো ভাবার আমন্ত্রণ! :: ৯৮
মানসিক দীনতা :: ১০০
ইখওয়ানুল মুসলিমিন আন্দোলন :: ১০১
মিসরীয় বিপ্লব ও আরববিশ্বের উপর তার নেতৃত্বের মন্দ প্রভাব :: ১০২
বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্মত্যাগের প্রারম্ভিকা :: ১০৩
সন্দেহবাদের সক্রিয় প্রচারণা এবং আরব দেশগুলোর মানসিক বিভ্রান্তি :: ১০৪
অলাভজনক সওদা :: ১০৫
আনোয়ার সাদাতের শাসনামলে মিসর :: ১০৭
শাম ও ইরাক :: ১১০
সিরিয়ার অসহায়ত্ব এবং বাথ পার্টির ব্যর্থতা :: ১১৩
অর্থনৈতিক হতাশা এবং অবিশ্বাস :: ১১৫
ইরান :: ১১৬
ইরানের ইসলামি বিপ্লব :: ১১৮
আয়াতুল্লাহ খোমেনির দৃষ্টিভঙ্গি :: ১২০
ইন্দোনেশিয়া :: ১২২
অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া :: ১২৩
পাশ্চাত্যায়নের পথে সদ্য স্বাধীন ইসলামি দেশগুলো :: ১২৪
তিউনিসিয়া :: ১২৫
আলজেরিয়া :: ১২৯
কমিউনিজম এবং এর সহযোগীরা :: ১৩৪
ইসলামিক ক্যালেন্ডারের উপর আপত্তি :: ১৩৯
লিবিয়া ও মরক্কো :: ১৩৯
ভাঙচুরের প্রক্রিয়া এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অপসারণ :: ১৪০
প্রগতিশীলদের পশ্চাদপসরণ :: ১৪০
আধুনিকতাবাদের প্রচারকদের অনুকৃতি :: ১৪১
ধর্মহীনতা এবং নাস্তিকতার প্রচারকদের দ্বিমুখী নীতি :: ১৪২
দরিদ্র মুসলিম দেশগুলির রাজকীয় ব্যয়বিলাস :: ১৪৪

সরকার ও জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব :: ১৪৫
সুপ্ত শক্তির অবমূল্যায়ন :: ১৪৬
পশ্চিমা সভ্যতার অনুসরণের ফল :: ১৪৬
পাশ্চাত্যায়নের সর্বজনীন প্রবণতার কারণ ও তার প্রতিকার ::
আধুনিকতা ও পশ্চিমায়নের কারণ ও তার প্রতিকার :: ১৫১
পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা :: ১৫১
বিষের প্রতিষেধক :: ১৫৭
পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ এবং তাদের গবেষণা ও চিন্তাধারার প্রভাব :: ১৫৯
ইসলামি উলুমের অবক্ষয় এবং আলেমদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবনতি :: ১৬৭
ইসলামি আইনের নব সম্পাদনার জরুরত :: ১৭৮
আশার আলো :: ১৭১
ইসলামি বিশ্বের নিজস্ব মুজতাহিদসুলভ ভূমিকা :: ১৭১
ইসলামি উম্মাহর অবস্থান ও তার দাওয়াহ :: ১৭২
শক্তিশালী, সচেতন, সৎ ও সংস্কারক মুসলমান :: ১৭৩
জীবন, পরকালের জন্য একটি ক্রান্তিকাল :: ১৭৩
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রোহী সভ্যতা :: ১৭৭
ইসলামি প্রাচ্যের আধুনিকতাবাদী নেতাদের উপর বস্তুবাদের আধিপত্য :: ১৭৭
বুদ্ধিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা :: ১৭৮
ইস্পাতের কঠোরতা আর রেশমের কোমলতা :: ১৭৯
পশ্চিম থেকে উপকার লাভের আসল ক্ষেত্র ও তার সীমা :: ১৭৯
মুসলিম দেশে ইসলামি সভ্যতার গুরুত্ব :: ১৮০
ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বড় শূন্যতা :: ১৮২
ইসলামি জগতের মরদে কামিল :: ১৮৩
মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা এবং আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন :: ১৮৫
শেষকথা :: ১৮৫

পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি কিছু মুসলিম দেশের নেতিবাচক কিংবা নিরপেক্ষ মনোভাব

ইসলামি দুনিয়া পশ্চিমা সভ্যতার পরাক্রমের কবলে

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসলামিবিশ্ব একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ সংকটের মুখোমুখি হয়। এই সংকট সম্পর্কে সঠিক কর্মপন্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপরই নির্ভরশীল ছিল একটি স্থায়ী ও মুক্তবিশ্বে তাদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্বের বুনিয়াদ।

এটি ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট, যা সক্রিয়তা, প্রাণশক্তি, উদ্যম ও সংকল্প, উন্নতি ও প্রসার-সক্ষমতার সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ; যাকে মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রসারশীল সভ্যতা হিসেবে গণ্য করা যায় এবং যা বস্তুতপক্ষে (গভীর দৃষ্টিতে যদি বিচার করা হয়) সে-সমস্ত কার্যকারণের একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিণতি; ইতিহাসের অভ্যন্তরে যেগুলো দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে আসছিল এবং উপযুক্ত সময়ে এই নতুন রূপে হাজির হওয়ার অপেক্ষায় ছিল! ইসলামি দুনিয়া সবচেয়ে বেশি এই ঝুঁকির মুখে পড়েছে। কারণ, জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে প্রাচীন ধর্মগুলো অপসৃত হওয়ার পরে, ইসলাম ধর্মীয় ও নৈতিক আহ্বানের একমাত্র ধারক এবং মানুষের সমাজজীবনের একমাত্র অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া বিপুল উর্বর এবং উৎপাদন শক্তির অধিকারী দেশগুলো এই মুসলিমবিশ্বে অবস্থিত। ফলত বস্তুবাদী এবং যান্ত্রিক পশ্চিমা সভ্যতার চ্যালেঞ্জ অন্য যেকোনো জাতি এবং সমাজের চেয়ে ইসলামি বিশ্বের প্রতিই ছিল সবচেয়ে বেশি।

মিশ্র সভ্যতা

এ সভ্যতাটি নিজের বিস্তৃত পরিসরে বিশ্বাস ও ধারণা, বৌদ্ধিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দর্শন, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও নাগরিক বিজ্ঞানের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, যা পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতির দীর্ঘ অভিযাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত হয়েছে। এ সভ্যতা সাধারণভাবে মানবিক এবং বিশেষত পদার্থবিজ্ঞান এবং গাণিতিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষায়নের অবশ্যম্ভাবী পর্যায়ক্রম এবং চিন্তাবিদ এবং পদার্থবিদদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরীক্ষার সারনির্যাস। সুতরাং, পশ্চিমা সভ্যতা বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদানের সমবায়ে পরিগঠিত হয়েছে; তাই এর ব্যাপারে একক ও অভিন্ন অভিমত দেওয়া যায় না।

এই সংমিশ্রিত সভ্যতার পরিগঠক উপাদানগুলোর মধ্যে অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ, ক্ষতিকর, উপকারী এমনকি ভুল উপাদানও শামিল ছিল। এতে জ্ঞানের সে-সমস্ত স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের সাথে এমন সব ভুল ধারণা, অনুমান, কল্পনা ও দাবিসর্বস্ব সিদ্ধান্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিতর্কের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। এভাবে এমনসব বৈজ্ঞানিক ফলও এতে যুক্ত, যা ছিল দুর্দান্ত চিন্তাভাবনা, অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার সারৎসার। এর উপাদানে এমন কিছু বিষয়ও ছিল, যা সময়ের আগেই বলে ফেলা হয়েছিল, আবার এমন উপাদানও ছিল, যা

কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির সাথে বিশিষ্ট ছিল না, যেমন অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান। এমন উপকরণও ছিল, যেগুলিতে পশ্চিমা সভ্যতার স্থানীয় প্রভাব ও চেতনা পুরোপুরি বিদ্যমান এবং পশ্চিমা পরিবেশ ও সমাজের উপর যার গভীর প্রভাব পড়েছিল, যা ছিল ঐতিহাসিক বিপ্লব এবং ঘটনাপ্রবাহের ফসল, যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমা জাতিগুলোর অতিক্রম করতে হয়েছিল। সর্বোপরি এর মধ্যে এমন উপাদানও শামিল ছিল, ধর্ম ও বিশ্বাসের সাথে যার ছিল গভীর সংযোগ, আবার এমন কিছু উপাদানও ছিল, ধর্মের সাথে যার কোনো যোগাযোগ নেই।

এই বহুবিচিত্র সংমিশ্রণ সমস্যার জটিলতা এবং গুরুতরতাকে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করেছে এবং ইসলামি বিশ্বকে একটি নাজুক ও কঠিন অবস্থানের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মুসলিমবিশ্বের শাসক এবং চিন্তাবিদদের সামনে হাজির হয়েছে একটি মহাপরীক্ষা হিসেবে।

নেতিবাচক মনোভাব ও অবস্থান

এই নতুন এবং জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বাভাবিকভাবে তিনটি অবস্থান হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে নেতিবাচক (Negative), এর অর্থ হল ইসলামি বিশ্ব এই সভ্যতার সমস্ত অর্জন এবং উপকারসম্ভার প্রত্যাখ্যান করবে এবং কোনো ভালো বা মন্দ কথা শোনার গরজবোধ করবে না, কিংবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে এর থেকে দূরে সরে থাকবে। না এর কোনোরকম সদ্ব্যবহার করবে আর না পশ্চিমের মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের যেসকল শাখায় উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, তা স্পর্শ করতে প্রস্তুত। এমনকি প্রদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তির মতো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পশ্চিম থেকে জ্ঞানগত উপকার অর্জনকে হারাম এবং একটি 'নিষিদ্ধ বৃক্ষ' বলে বিবেচনা করবে। এভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি, মেশিন, সরঞ্জাম এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণ করা থেকেও পুরোদস্তর বিরত থাকবে।

এই অবস্থানের প্রাকৃতিক ও শরয়ি বিচার এবং এর পরিণতি

এই অবস্থানের প্রাকৃতিক পরিণতি ইসলামি বিশ্বের পশ্চাদপদতা এবং জীবনের চলন্ত কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বাকি দুনিয়া থেকে ইসলামের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং ইসলামি বিশ্ব এমন একটি সীমিত এবং নগণ্য দ্বীপে পরিণত হবে; আশপাশের জগতের সাথে যার কিছুমাত্র যোগসূত্র নেই। সমুদ্রে এরূপ অগুনতি দ্বীপ থাকতে পারে, কিন্তু ভূ-ভাগে এই জাতীয় দ্বীপের কোনো স্থান নেই। তদুপরি মানবপ্রকৃতির সাথে (যা তার চারপাশের পরিবেশ দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হয়) যুদ্ধ করে কখনো সফল হওয়া সম্ভব নয়।

এ সমস্ত বাস্তবতা ছাড়াও, এই দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ দৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা প্রাকৃতিক শক্তি এবং সংস্থানকে স্থবির করে দেয় এবং এটি সেই দীনের বাস্তব ব্যাখ্যা ও সঠিক উপস্থাপন নয়, যাতে এই বিপুলা বিশ্বের অপার সৃষ্টি-রহস্যে বুদ্ধির ব্যবহার ও গবেষণার উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং উপকারী জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার

প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং যে ধর্ম তার অনুসারীদের আপন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শত্রু ও প্রতিপক্ষের কারসাজি ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার চেষ্টায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۞ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য (আল্লাহর মারিফাতের) বহু নিদর্শন রয়েছে। (এবং এই জ্ঞানী লোকগণ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন হয় না; বরং) দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (এই স্মরণ ও চিন্তনের ফলস্বরূপ তাদের জন্য সত্য ও হাকিকতের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়) এবং তারা চিৎকার করে বলে ওঠে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ সমস্ত কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করো নি। তুমি যাবতীয় অর্থহীনতা থেকে পবিত্র। হে খোদা! তুমি আমাদের আগুনের শাস্তি (যা দ্বিতীয় জীবনে আসবে) থেকে রক্ষা করো![১]

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

এবং যতদূর সম্ভব, হে মুসলমান, তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি কর এবং ঘোড়াগুলি প্রস্তুতিপূর্বক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আপন সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে রাখ, যাতে তোমরা আল্লাহ এবং আপন শত্রুদের পরাজিত করতে সক্ষম হও।[২]

হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

হেকমতপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো ধন; সুতরাং যে যেখানেই তা পায় সেই হবে এর অধিক হকদার। (সুনানে তিরমিজি, ২৬৮৭)

ইসলাম এই ভূখণ্ডে মানুষকে আল্লাহর খলিফা বলে ঘোষণা করেছে, যার জন্য অধীন করে দিয়েছে জল-স্থল, সূর্য-চন্দ্র এবং দিন-রাত্রি। মানুষ মনে বা মুখে যেই জরুরতের কথা ব্যক্ত করেছে, তা তাকে দান করা হয়েছে। আল্লাহ তার বান্দাদের উপর এই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন যে, তিনি তাদের ইস্পাত সরবরাহ করেছেন, যাতে রয়েছে দৃঢ়তা এবং মানবজাতির জন্য অনেক উপকারিতা। সামরিক প্রস্তুতি, যুদ্ধ-উপকরণের দিকে মনোযোগের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর রাসুল স্বয়ং ব্যবহারিক নমুনা উপস্থাপন

[১] আলে ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯১
[২] আনফাল, আয়াত ৬০

করেছেন। উহুদযুদ্ধে তিনি পারসিকদের অনুসরণে একটি পরিখা খনন করেন। পরবর্তীতে সেই দৃষ্টান্তের উপর আহলে ইলম ও ফকিহগণ অবিচলতা দেখিয়েছেন। তারা এক্ষেত্রে যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলেছেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধ-সরঞ্জামের ব্যবহার, স্বীয় স্থিতি ও উপকারী জ্ঞানের আহরণের জন্য তারা অন্যান্য জাতির সঙ্গে আগ বেড়ে অংশ নিয়েছেন এবং কখনো কখনো তারা এক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামিতা ও নেতৃত্বের ছাপচিত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

যদি কোনো দেশ চোখ-কান বন্ধ করে আধুনিক সভ্যতার পরাক্রমী চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করার চেষ্টা করে, অথবা তাকে একেবারে পাত্তা না দিয়ে সুখনিদ্রায় দিনাতিপাত করতে চায় এবং নিজের সীমিত পৃথিবীর বাইরে যেতে প্রস্তুত না হয়, তবে সেই দেশটি বেশিদিন স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় বহাল থাকবে না। তাকে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মুখোমুখি হতে হবে। এর বিভিন্ন অংশে অবাধ্যতা এবং বিরোধিতার তীব্র আন্দোলন উত্থিত হবে। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান সেই মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি, যা সর্বদা সম্মুখপানে আগুয়ান, যা নতুন কিছুর জন্য সতত উন্মুখ এবং কোনো অবস্থাতেই যার তৃপ্তি হয় না। মর্যাদা, মহিমা, শক্তি ও প্রতিপত্তি এবং নবায়ন ও সংস্কারের উন্মাদনা মানুষের অস্থিমজ্জায় বিরাজমান। প্রতিমুহূর্তে মানুষ তাই একটি নতুন গন্তব্যের অন্বেষা এবং একটি নতুন অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে।

সেই সাথে এই অবস্থান সৃষ্টিতাত্ত্বিক নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং মহাবিশ্বের মেজাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কোনো দেশ জোরপূর্বক এই প্রকৃতিবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে, তবে এই সভ্যতা তার ঘরে ও পরিবারে সেভাবেই ঢুকে পড়বে, যেভাবে বন্যার জল বিনা নোটিশেই প্রবেশ করে গ্রাম-শহর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

বিচ্ছিন্নতার পরিণতি

আধুনিক সভ্যতার অভিঘাত থেকে কোনো মুসলিম দেশ সুরক্ষিত থাকলেও, তার আঁচল এর মন্দ দ্বারা কলুষিত না হলেও, এর উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকরণ-সংস্থান থেকে হাত গুটিয়ে নিজের সীমাবদ্ধ জগতে আবদ্ধ থাকলেও, এই কালপর্ব বা পর্যায়টি খুব বেশি স্থায়ী হয়নি। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাক্রম তাকে ক্রমশ আক্রান্ত করেছে এবং তার শান্তি ও নিরাপত্তার স্বপ্নকে করেছে বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত।

পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব, শক্তি এবং প্রসারতা সম্পর্কে সচেতন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জানেন যে, প্রাচ্যের দেশগুলো আধ্যাত্মিক ও বস্তুগতভাবে কতটা দুর্বল হয়েছে এবং সেই ঈমানি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের শক্তি কী পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, যা দ্বারা এই সভ্যতার সফলভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হত। এই আশঙ্কাকারী ন্যায়সঙ্গত হবেন যে, এই দেশগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রক্ষা-প্রাচীর দীর্ঘ সময় অটুট থাকবে না। কারণ, অনির্ভরতা, হীনম্মন্যতা এবং আধ্যাত্মিক দুর্বলতার বোধসম্পন্ন একটি জাতি তার স্বকীয়তা বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না এবং এমন একটি শক্তিধর সভ্যতার মোকাবেলা করতে পারে না, যার সাথে কালের প্রবণতা শামিল হয়ে গেছে।

মশহুর পশ্চিমা পণ্ডিত মুহাম্মদ আসাদ[১] ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে আরব উপদ্বীপে ভ্রমণ করেন, যা সে অবধি প্রাচীন আরব এবং ইসলামি ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা তখনও তাতে অনুপ্রবেশ করেনি। আধুনিক প্রাযুক্তিক উপায়-উপকরণ এখনও বালুকাময় প্রাচীরের বেষ্টনী অতিক্রম করতে পারেনি। এ সমস্ত ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করে এই বিচ্ছিন্নতা, পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব থেকে দূরত্বরক্ষা দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারবে কি না মর্মে তিনি তার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন :

> আমি বিচার-বিবেচনা করে এই জিজ্ঞাসায় উপনীত হলাম যে, যায়েদ[২] এবং যায়েদের কওম (আরব) কতদিন ধরে তারা নিজেকে এই খতরা থেকে নিরাপদ রাখতে পারবে, যা অজস্র হিলা-বাহানায় তাদের ঘেরাও করছে এবং কোনো প্রকার ভদ্রতা ও সৌজন্য ব্যতিরেকেই তাদের উপর অচিরেই আরোপিত হতে চলছে। আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন প্রাচ্য ধেয়ে-আসা পাশ্চাত্যের মোকাবেলায়, যা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে অসহায় করে তুলছে, নীরব, নির্বিরোধ, নিরপেক্ষ মধ্যদর্শক হয়ে টিকে থাকতে পারবে না। অসংখ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংঘবদ্ধ শক্তি বর্তমানে ইসলামি বিশ্বের দরোজায় কড়া নাড়ছে। ইসলামি বিশ্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে আত্মসমর্পণ করে এই সংঘাতের পরিণতিতে কেবল নিজের ঐতিহ্যবাদী কাঠামোই খোয়াবে না; বরং আধ্যাত্মিক শেকড় ও সংযোগও হারিয়ে বসবে।[৩]

মুহাম্মদ আসাদের উদ্বেগ বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। এই সময়কাল দীর্ঘ হতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতা ইসলামি বিশ্বের এই পবিত্র কেন্দ্রে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে। আধুনিক প্রযুক্তি, পাশ্চাত্য পণ্যসামগ্রী বন্যার মতো আছড়ে পড়ে। বিলাসী উপকরণ এবং অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে বাজার-ঘর ছেয়ে যায়। জীবনের সারল্য, সংযম, বীরত্ব এবং উদ্যম ইত্যাকার গুণাবলি অদৃশ্য হয়ে যায়, যা আদিকাল থেকেই আরবদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

আরব উপদ্বীপ এবং পশ্চিমের এই নব্য কুটুম্বিতা হয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং পলিটিক্স ও পেট্রোলের পথ ধরে। এই আদান-প্রদান ও সুবিধাগ্রহণ হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রজ্ঞাহীনভাবে। এর পিছনে ভারসাম্যময় চিন্তা বা সুচিন্তিত পরিকল্পনা কোনোটাই ছিল না। আর তাই পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় পরাজয়বরণ, যার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন আসাদ, একটি বাস্তব ঘটনা হয়ে হাজির হয়েছে এবং ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং বাহ্যিক রূপান্তরের পর, এখন এই দেশের আধ্যাত্মিক শেকড়-সম্বন্ধও সেই ঝড়ের কবলে পতিত হয়েছে।

---

[১] বংশগতভাবে তিনি ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদি। নাম লিওপোল্ড উইস। তুখোড় সাংবাদিক ও বিশ্লেষক লিওপোল্ড আরব ও পাশ্চাত্যে প্রবল সাড়া ফেলেছিলেন। আরববিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে ১৯২৬ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পরে মুহাম্মদ আসাদ নামধারণ করেন, যেখানে আসাদ তার মূল নাম লিও (সিংহ) এর আরবি। তার রচনা ও জ্ঞানকর্ম আধুনিক মুসলিমচিন্তায় এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে ধরে নেওয়া হয় ইউরোপ মহাদেশের তরফ থেকে ইসলামের সমীপে শ্রেষ্ঠতম উপহার হিসেবে। জার্মান নওমুসলিম চিন্তাবিদ মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান (১৯৩১-২০২০) ঠিকই লিখেছেন, 'আসাদ ইসলামকে দেওয়া ইউরোপের উপহার। ইউরোপ বহু শতাব্দী ধরে ইসলামের সাথে যে দুশমনি করে আসছে, আসাদের মাধ্যমে সেই ক্ষত কিছুটা পোষানো যেতে পারে।'

[২] এই যায়েদ ছিলেন মুহাম্মদ আসাদের আরব সফরকালে তার গাইড ও সফরসঙ্গী।

[৩] The Road To Mecca. p. 103, 104

এই রূপান্তর ও বিপ্লব, আরব উপদ্বীপের শান্ত মরুভূমিতে পশ্চিমা প্রযুক্তি, বিলাসিতার সরঞ্জাম ও পণ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য, জীবনযাত্রার মান আকস্মিকভাবে উন্নত হয়ে যাওয়া এবং বহু শতাব্দীর সরল, সাদাসিধে ও কর্মবাদী জীবনের জটিল হয়ে ওঠাকে স্বয়ং পশ্চিমারা অনুভব করে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। মার্কিন লেখক ডন পেরেট (Don Perete) তার The Middle East Today বইতে লিখেছেন :

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তেল দ্বারা অর্জিত সম্পদের কারণে অনেক ঐতিহ্যবাহী প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রাচীন সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, যা বিভিন্ন শ্রেণিকে সংযুক্ত রেখেছিল, এখন নিঃশেষ হতে চলেছে। কেননা শেখদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা, যারা তেলের সম্পদে ধনী হয়ে উঠেছে, তারা পশ্চিমা পণ্যসামগ্রী, অভিনব জিনিসপত্র, রীতিনীতি এবং পাশ্চাত্যের রুচি-অভিরুচি দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে এবং এই পরিবর্তনের অবগতি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণিতে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। কারণ, এ ধরনের শান-শওকতপূর্ণ জীবনযাপন করার সামর্থ্য তাদের নেই।[১]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন :

> অন্যদিকে সম্পদের আকস্মিক উৎপাদন, যা মহাশক্তিধর সৌদ-পরিবারের কোষাগারে জমা হয়েছিল, সেই সাথে ঘুস, স্বজনপ্রীতি এবং চরম আর্থিক দায়িত্বহীনতার সৃষ্টি করেছিল। তেল থেকে অর্জিত সম্পদের বেশিরভাগই অপচয় হয়ে যাচ্ছিল এবং এর আসল সুবিধাভোগীরা ছিল রাজপরিবার। বাদশাহ এবং তার বংশধরেরাই শুধু নয়; বরং তার স্ত্রী এবং শ্বশুরালয়ের লোকজন, যাদের সংখ্যা কয়েক লাখ, সবাই একই পরিমাণ সম্পদ সরাসরি লাভ করেছিলেন। এবং এখনকার সৌদি শাসক-পরিবার, তখনকার সময়ে মরুভূমিতে রাজত্বকারী ওহাবি শেখের অবস্থানে নেই; বরং প্রাচ্যের জাঁকজমক নিয়ে সবধরনের বিলাসিতার সাথে বাস করেন, ডজন খানেক যুবরাজ একের পর এক দামি দামি মোটর গাড়ি কিনছেন এবং একের পর এক এমন আলীশান প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, যা আধুনিক স্টাইলের আরামদায়ক সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত।[২]

সামনে বেড়ে তিনি আরও লেখেন :

> ওহাবি উপজাতিগুলো একসময় যে উদ্যম নিয়ে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ রক্ষা করত এবং এ ব্যাপারে তারা যে সরলতার উপর জোর দিয়েছিল, তা এখন সম্পূর্ণ গরহাজির! এখন বিদেশি পণ্যের বিলাসের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবাদ নেই। আজ সেসবের কেবল স্বীকৃতিই দেওয়া হয়নি; বরং সমাজের সকল শ্রেণিই তাদের পেতে সচেষ্ট বলে মনে হচ্ছে। যে গোত্রগুলো ওহাবি ধারার সহজ ও নিরস জীবনযাপন করত, তারা এখন মরুভূমি ত্যাগ করে নতুন তেলক্ষেত্রের কাছে আশ্রয় পাচ্ছে, যেখানে আবাস স্থাপনের পরে তারা পশ্চিমা উদ্ভাবিত বস্তুসামগ্রীতে অভ্যস্ত ও আসক্ত হয়ে উঠেছে, যা তারা ARMCO-তে তেল সরবরাহের সুবাদে প্রাপ্ত বেতনের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে।[৩]

---

[১] The Middle East Today, p. 402

[২] The Middle East Today, p. 406, 407

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরব উপদ্বীপ স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সংবেদনশীল প্রয়াস যদি চালানো হত, পরিকল্পনা, সংগঠন এবং দেশ গঠনমূলক পথে উন্নয়ন ও স্থিতিশীল করার আন্তরিক প্রচেষ্টা যদি নিয়োগ করা হত তাহলে দেশটি এমন হীনভাবে পশ্চিমের দ্বারস্থ হত না। তদ্রুপ যদি পশ্চিমা সভ্যতার উপর পর্যালোচনামূলক এবং পাণ্ডিত্যসুলভ দৃষ্টিপাত করা যেত, এবং خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدِرَ (যা কিছু শুভ্র সুন্দর তা-ই গ্রহণ কর, অসুন্দর আবর্জনা সব বর্জন কর)-এর প্রাচীন ইসলামি ও আরবি নীতির অনুসরণ করা হত তাহলে এভাবে তা ইসলামের কেন্দ্রভূমির দিকে বন্যার মতো ধেয়ে আসত না এবং এর বাহ্যাড়ম্বরতার দিকটিই কেবল তাদের ভাগে পড়ত না। এর জন্য যে দূরদর্শিতা, মনন ও ধৈর্যশীলতার প্রয়োজন, তার অভাব ছিল সেই শ্রেণিটির মধ্যে, যার পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদন করার কথা ছিল।

ইসলাম ও দাওয়াতে ইসলামের প্রথম দোলনায় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এটির একটি চিরন্তন এবং বিশিষ্ট মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যাকে প্রথমে বিবেচনায় নিতে হবে এবং সমস্ত প্রোগ্রাম ও প্রকল্প, সংস্কার ও উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা এবং সময় ও স্থানের সকল বিবেচনা অবশ্যই এর অধীন এবং অনুগামী হতে হবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং আধুনিক সুবিধার গ্রহণ ও ব্যবহারের প্রতিটি সুযোগেই ইসলামের মৌলভিত্তিকে মূলনীতি করতে হবে এবং এর সভ্যতা, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার জন্য এমন জুতসই পোশাক প্রস্তুত করতে হবে, যাতে তা এর অবয়বের সাথে সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয় এবং এর আধ্যাত্মিক মূল্য-মান রক্ষিত হয়। সর্বোপরি এটি সর্বদা সমস্ত মানবতার কাছে যে পয়গাম পৌঁছে দিতে আদিষ্ট, তার সঙ্গে মানানসই ও প্রাসঙ্গিক হয়।

অনুরূপভাবে, এ কথা বর্ণিত মূলনীতির ন্যায় স্থির থাকা উচিত যে, আরব উপদ্বীপ মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সা. এর রোপিত বাগান এবং তার দাওয়াতের ফসল। তাই শুধুমাত্র তিনি, তার সঙ্গীগণ এবং যারা তার দাওয়াহর প্রতি বিশ্বাসী, তাদেরই এর উপর অধিকার রয়েছে। একে সেই সত্যেরই একটি দর্পণ হওয়া উচিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। এই ভূখণ্ডের জন্য জরুরি হল এমন কিছু থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা, যা এর চিন্তানৈতিক এবং ধর্মীয় নিরাপত্তার পরিপন্থি এবং এর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব দুর্বল করে। ভবিষ্যতের এই আসন্ন বিপদের পরিপ্রেক্ষিতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিব্যদৃষ্টি আরব উপদ্বীপ থেকে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিতাড়নের ওসিয়ত করেছিল এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসুল সা. এর পয়গাম্বরসুলভ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ওসিয়ত অমুসলিমদের শুধুমাত্র শারীরিক বহিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের সকল ধরনের প্রভাব এবং তাদের প্রচার ও সংস্কৃতির অপসারণও এর অন্তর্ভুক্ত, যেটা বিবেকবান মানুষমাত্রই বুঝতে পারেন।

এ ছাড়াও এই দ্বীপে দুটি পবিত্র হারাম অবস্থিত। এখানেই বালাদ-ই-আমিন (নিরাপদ নগরী), যেখানে রাসুল সা. জন্মগ্রহণ করেন, বেড়ে ওঠেন এবং নবুওয়াত দ্বারা অভিষিক্ত হন, যেখানে হজের কর্তব্য ও তার মানাসিক (আচার-অনুষ্ঠান) সম্পন্ন হয়। এই ভূখণ্ডে

রয়েছে সেই প্রিয় শহর মদিনা, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করেছিলেন, যেখানে তার মসজিদ ও দরসগা নির্মিত হয়েছিল, যেখানে প্রথম আদর্শ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেখানে ইসলামি দাওয়াহ ও এর বিজয়ের সূচনা হয়েছিল। অতএব, এই পরিবেশটির হওয়া উচিত ইসলামি জীবনের একটি সুষ্ঠু দোলনা এবং এর স্বচ্ছ আয়না, যেখানে পৌঁছে প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূত হওয়া উচিত যে, তিনি ইসলামের দোলনায় আছেন, যেখানে ইসলামের আসল রুচিবোধ ও মেজাজের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, মহান আল্লাহ এই ভূমিকে চিরকালের জন্য হজের মারকায এবং মুসলমানদের বার্ষিক মিলনকেন্দ্র বানিয়েছেন। তাই তাদের এই বিশ্বাস ও আস্থা রাখার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে, তারা এমন একটি শহরের উদ্দেশ্য করছেন, যা পবিত্রতার আকর, দীনের দোলনা এবং ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রাজধানী। আর প্রাকৃতিকভাবেই এ ভূখণ্ডটি ইসলামবৈরী প্রবণতা এবং শিক্ষাধারার বিরূপ প্রভাব থেকে এত দূরে যে, আধুনিক সময়ে যার কল্পনা করা যেতে পারে না এবং এটি পশ্চিমা সভ্যতার কাছে ইসলামিবিশ্ব থেকে দূরে অবস্থিত অন্য যেকোনো দেশের মতো আত্মসমর্পণ করেনি, যা এই বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের ধারক-বাহক নয়।

এ পরিকল্পনায় সরলতা, মৌলিকতা এবং কিছুটা তাকওয়াও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে দূরবর্তী স্থান থেকে আগতরা সেই পরিবেশ ও প্রতিবেশ অনুভব করতে পারেন, যাতে পূর্ববর্তী মুসলমানরা তাদের হজ আদায় করতেন এবং তাদের মধ্যেও তাদের মতো চেতনা জাগরূক হয়। এমন যেন না হয় যে, স্রেফ হারাম শরিফই ইবাদত ও প্রশান্তির বিশেষ দ্বীপ হয়ে উঠবে, যার চারপাশে বস্তুবাদী সভ্যতার সমুদ্র ঢেউ তুলছে এবং বিদ্রোহী ঢেউয়েরা তার দেয়ালের পরে আছড়ে পড়ছে এবং ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে।

নিরেট সামাজিক ঐতিহ্য এবং দেশীয় সংস্কার একটি নবপ্রাণ সভ্যতার মোকাবেলা করতে পারে না

এই নেতিবাচক কালপর্ব প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যের কোনো দেশেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কারণ ঐতিহ্য ও প্রথা বা সামাজিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, যার পেছনে বোধ ও অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তিশীল কোনো দৃঢ় বিশ্বাস থাকে না, থাকে না তার সাথে মেধা ও বুদ্ধিমত্তা এবং ইসলামের চিরন্তন নীতিকে এই পরিবর্তিত বিশ্বের বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার এবং আধুনিক সভ্যতার ভালো ও দরকারি উপাদান এবং অসৎ ও অকেজো উপাদানের পার্থক্য করার পূর্ণ সামর্থ্য, তা এই প্রসারমান সভ্যতার মোকাবেলায় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না এবং এর দ্বারা জাতির সুরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে না। প্রতিটি দেশ যা তার প্রাচীন ঐতিহ্য লালন করে, কিন্তু সেগুলো প্রতিষ্ঠিত রাখার, প্রসারিত করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এবং শক্তিশালী বিশ্বাস ও পরিপক্ক বুদ্ধিমত্তা থেকে রিক্তহস্ত, তার ভাগ্যে, বিলম্বে কি অবিলম্বে, পতন ছাড়া কিছুই নেই।

তদ্রুপ, যদি পশ্চিমা সভ্যতা এবং এর উপায়-উপকরণ ও সুবিধাগ্রহণ সুচিন্তিত পরিকল্পনা, বিচক্ষণতা এবং ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধের ভিত্তিতে না হয় তাহলে এই সভ্যতা দেশের নেতৃবৃন্দ ও নীতিনির্ধারকদের এবং ধর্মীয় আলেমদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গিয়েই দেশ-সমাজকে জোরপূর্বক দখল করে নেবে। সাধারণ জনগণ এটাকে

উষ্ণভাবে স্বাগত জানাবে। লেখক চিন্তাবিদরা এর পথ পরিষ্কার করবে এবং দেশের মানুষ ভালো-মন্দ এবং উপকারী-অপকারী পার্থক্য না করেই অভুক্তের মতো এর উপর ঝাপিয়ে পড়বে। ফলে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের দেখা যাবে নিদারুণ অসহায় এবং নেতৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চিরতরে চলে যাবে।

প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং প্রাজ্ঞ পদক্ষেপ

কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশই এই শেষযুগে এসে একে একে পশ্চিমা সভ্যতার গ্রাসে পরিণত হয়েছে এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই এই বানপ্রবাহ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এর কারণ ছিল তাদের নেতৃত্বে ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং বাছ-বিচার করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব এবং ছবির উভয় পিঠ দেখতে না পারা। শিক্ষাব্যবস্থা এবং দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনাও আধুনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়নি। এর বাইরে (এবং সর্বোপরি) সঠিক ইসলামি শিক্ষা থেকে বিচ্যুতি দেশে এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে কোনোভাবেই সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না এবং তাতে কোনোকালেই অস্তিত্বরক্ষার পুঁজি ছিল না; এই অস্থির, পরিবর্তনশীল ও পরিবর্তনকামী যুগের মধ্যে তো নয়ই!

একই ট্র্যাজেডি আফগানিস্তানেও ঘটেছিল, যা তার রীতিনীতি মেনে চলা এবং প্রাচীন আফগান ঐতিহ্যের প্রতি অবিচলতার জন্য প্রাচ্যজুড়ে পরিচিত। কিছু সময়ের জন্য তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং সবধরনের ভালো-মন্দ পরিবর্তনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি তারা দাঁত চেপে ধরেছিল। তারা এমনকি আধুনিক সভ্যতার উপকারী ও দরকারি উপাদানগুলিও গ্রহণ করতে সহনশীল ছিল না। রাশিয়া ও হিন্দুস্থানের (যা তখন ব্রিটিশ রাজত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ) মধ্যে অবস্থিত হওয়া এবং বৃহৎ দায়-দায়িত্ব, স্পর্শকাতরতা ও বিপদ-আশঙ্কা সত্ত্বেও, যা এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এবং সময়ের সংবেদনশীলতার কারণে তৈরি হয়েছে, শিক্ষা, শিল্প ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এটি আধুনিক বিজ্ঞান, নতুন সংগঠন এবং প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন থেকে ছিল বঞ্চিত। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জনৈক প্রাজ্ঞ মুসলিম পর্যটকের বক্তব্য-বিবৃতি থেকে অনুমান পাওয়া যায়, যিনি ১৯১৫ সালে আফগানিস্তানে গিয়ে সেখানকার জীবন ও রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে আট বছর কাটান এবং একজন স্বদেশীয় মানুষের মতো সে-দেশের সুরতহাল অধ্যয়ন করেন। তিনি হচ্ছেন জাফর হাসান আইবেক।[১] আফগানিস্তানের শিক্ষার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তার 'আপবিতি' গ্রন্থে লিখেছেন :

[১] জাফর হাসান কর্নালের (পূর্বপাঞ্জাব) অধিবাসী। তিনি লাহোরের সরকারি কলেজে বিএ-র শেষবর্ষে ছিলেন। তিনি জিহাদি উদ্যম, ব্রিটিশ-বিরোধিতা এবং ভারতের স্বাধীনতার চেতনায় নিবেদিত হয়ে শিক্ষকতা ও ভারতকে বিদায় জানান। এবং

সে সময় আফগানিস্তান শিক্ষায় খুবই পিছিয়ে ছিল, সম্ভবত মোট জনসংখ্যার শতকরা একজন বা অন্তত দুইজন পড়তে ও লিখতে জানত এবং তাও ছিল সেই পুরোনো ধাঁচের মাদরাসা শিক্ষিত। পুরোনো রাজারা সম্ভবত তাদের প্রজাদের শিক্ষা দিতে ভয় পেতেন, পাছে তাদের দৃষ্টি খুলে যায় এবং তারা তাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে! আমির হাবিবুল্লাহ খান[১] (সিরাজুল মিল্লাত ওয়াদ-দীন) এর সময়ে সারাদেশে একটি সিভিল স্কুল (Habibya High School) এবং একটি মিলিটারি স্কুল ছিল মাত্র। আফগানিস্তানে নতুন শিক্ষা এবং বর্তমান উন্নয়ন শুরু হয়েছিল আমির হাবিবুল্লাহ খানের যুগে। যদি তিনি আমির আবদুর রহমান খান (জিয়াউল মিল্লাত ওয়াদ দীন) এর পরে আফগানিস্তানে রাজা না হতেন, হয়তো এদেশের কেউই নতুন সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির নামও জানতে পারত না।'[২]

কাবুল ছাড়া অন্য কোনো শহরে নতুন ধারার মাদরাসা ছিল না, লোকেরা পুরোনো রীতিতে মসজিদে পবিত্র কুরআন পড়া শিখে নিত। অফিসে কর্মরত ক্লার্করা (যারা আফগানিস্তানে মির্জা নামে পরিচিত) প্রাইভেটভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল। যাদের সাধারণ জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। ১৯০৫ সালে আমির হাবিবুল্লাহ খানের ভারত সফরের পর শিক্ষার নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটে।[৩]

আমরা (জালালাবাদে) চিঠি লেখার জন্য কাগজ ও খাম খুঁজলাম এবং দেখতে পেলাম, এমন কোনো দোকান নেই, যেখানে কলম বা পেন্সিল বিক্রি হয়। আমাদের বলা হল, কসাইয়ের দোকানে কাগজ বিক্রি হয়; কিন্তু কলম বিক্রির কেউ নেই।[৪]

আফগানিস্তানে তখনকার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা কেমন ছিল, তা নিচের উদ্ধৃতি থেকে অনুমান করা যায়। জাফর হাসান লেখেন :

সেসময় কাবুলে একটি বুট কারখানা ছিল, যেটি বেশিরভাগই সামরিক প্রয়োজন মেটাত, কিন্তু জনগণের জন্য খুব কম বুট তৈরি করা হত। সাধারণত কাবুলের বাজারে ভারতীয় এবং ইংল্যান্ডের তৈরি জুতা পাওয়া যেত। হাতে তৈরি সুতি কাপড় এবং পশমি কাপড়ও গ্রামে বেশি ব্যবহৃত হত। হেরাতে উটের পশম থেকে ভালো পশমিনা তৈরি হত। প্রচুর কার্পেট মেকার ছিল। এসব আফগানী কার্পেট বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হত।[৫]

পরিবহণ উপকরণ এবং বার্তা ও ডাক বিভাগের অবস্থা এই বিবৃতি থেকে অনুমান করা যাবে :

দেশত্যাগের অভিপ্রায়ে ১৯১৫ সালে কাবুল চলে যান। সেখানে তিনি মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধির শিষ্য, সহকারী এবং জেনারেল নাদির খানের একজন আস্থাভাজন ও সহকর্মী হয়ে বহুবছর ধরে ভারতের স্বাধীনতা এবং আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য সংগ্রাম করেন। ১৯২২ সালে, কর্মের সীমা সংকীর্ণ হওয়ায় এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারায় তিনি মাওলানা সিন্ধির সাথে কাবুল থেকে তুরস্কে পাড়ি জমান। তুরস্কে আর্টিলারি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন তিনি এবং সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় 'আপবিতি'র প্রথম অংশটি ১৯৬৪ সালে মনসুর বুক ডিপো লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

[১] হাবিবুল্লাহ খান (১৮৭২-১৯১৯) ছিলেন আফগানিস্তানের অন্যতম রাজা। ১৯০১ সাল ১৯১৯ সালে আততায়ীদের হাতে নিহত হওয়ার পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন।

[২] আপবিতি, ১:৫৫-৫৬

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

আফগানিস্তানে না তখন কোনো রেলওয়ে ছিল, না এখনও আছে। উপরন্তু, সেই সময়ে রাস্তা ছিল কম এবং কাঁচা। পাকা রাস্তাগুলি ছিল কাবুল শহরের এবং এর শহরতলির মধ্যে। এসব রাস্তায় থাকা সেতুগুলিও খুব শক্তিশালী ছিল না, বর্ষার দিনে বন্যায় বেহাল হয়ে যেত। কাবুল, কান্দাহার, হেরাত, মাজার-ই-শরিফ এবং গার্দেজ, গজনির মতো শহর ও বড় এলাকার রাস্তাগুলিরও ছিল নাজেহাল অবস্থায়। যদি কখনো কোনো মহান রাজপুত্র বা গভর্নরের এই দিকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত, তখন সেগুলি কোনোরকম মেরামত করে দেওয়া হত। অন্যথায় নয়। ঘোড়া, খচ্চর, টাট্টু এবং উট সাধারণত আরোহণ ও বোঝাবহনের জন্য ব্যবহৃত হত। মোটরগাড়ি শুধুমাত্র হাবিবুল্লাহ খানের আরোহণের জন্য ছিল, অন্যান্য রাজপুত্র এবং মন্ত্রীরা সাধারণত ঘোড়ায় চড়তেন, তাই তাদের আস্তাবলে ভালো ভালো ঘোড়া ছিল। ডাক-ব্যবস্থা খুবই প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, এবং বেশিরভাগই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ রাজ্যপাল এবং জেলা আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। লোকেরা সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কালে চিঠিপত্র নিয়ে যেত। আর এ ব্যাপারে তারা ডাক-সেবা থেকে কিছুমাত্র সুবিধা নিত না। ভারত থেকে ডাক-সাধারণত এক সপ্তাহে দু'বার আসত এবং কখনো কখনো শুধু একবার, বিশেষ করে শীতকালে। যাতে সংবাদপত্রও আসত। কাবুল এবং জালালাবাদের মধ্যে একটি টেলিফোন লাইন ছিল। এটি তখনই ব্যবহৃত হত, যখন আমির মহোদয় শীতকালে জালালাবাদে যেতেন, অন্যথায় তা সরকারি সংবাদ পৌঁছানো ছাড়া কোনো কাজে ব্যবহার করা হত না। ওয়্যার ডিপার্টমেন্টের কোনো অস্তিত্বই ছিল না।[১]

মহাযুদ্ধের সময়, যখন আফগানিস্তান দুটি শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল তখন সামরিক শক্তি, যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং আধুনিক অস্ত্রের দিক থেকে এর অবস্থা কীরূপ ছিল, আইবেক সাহেবের এই বক্তব্য থেকে তা অনুমান করা যায়। তিনি লিখেছেন :

তখন, আফগান সেনাবাহিনীর অস্ত্র ছিল খুব আদিম, শুধুমাত্র কাবুল সামরিক বাহিনীর হাতে নতুন ধরনের বন্দুক ছিল, যার মধ্যে কিছু ছিল জার্মানির তৈরি Mausers, আফগানরা সেগুলোকে বলত 'কুনিং জাগুরদার', এবং কিছু ইংরেজ মার্টিনি (Martini) বন্দুক ছিল। কয়েকটি মেশিনগান (Machine Gun) এবং দুটি জার্মান কুইক ফায়ারিং (Quick firing) ছিল। বাকি কামানগুলি পুরোনো এবং ক্ষীণ ছিল। সম্ভবত বিশ্বের কোথাও সেগুলোর ব্যবহারের রেওয়াজ তখন আর অবশিষ্ট ছিল না। আর, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য সরকারিভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হত না; বরং তাদের শুধুমাত্র মাসিক বেতন দেওয়া হত, যা তাদের সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য যথেষ্ট হওয়াই ছিল কঠিন। তারা নিজেরাই ময়দা কিনে রুটি-তরকারি রান্না করতেন। এদিক-ওদিক থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করতেন। এতে তাদের সামরিক কুচকাওয়াজের জন্য খুব কম সময়ই বাঁচত। তাই সেখানে না ছিল সামান্যতম সামরিক শৃঙ্খলা আর না তাদের উদ্যমী ও শক্তিশালী দেখাত।[২]

পরিষেবার অভাব ও ঘাটতি মূল্যায়ন করা যাবে এখান থেকে :

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

সারাদেশের শুধুমাত্র কাবুলে একটিমাত্র বেসামরিক এবং সামরিক হাসপাতাল ছিল, সিভিল হাসপাতালের প্রধান সার্জন ছিলেন তুর্কি ডা. মুনির বেগ এবং ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ছিলেন ডা. ফাখিমা বেগ। এখানে ভারতীয় কম্পাউন্ডাররা কাজ করতেন; মিলিটারি হাসপাতালের ইনচার্জ ছিলেন লাহোরের ডা. জাওয়ায়া, যিনি আমাদের সহকর্মী সুজাউদ্দৌলার আত্মীয় ছিলেন।[১]

দপ্তরের কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীলদের যোগ্যতার মানও খুব নিম্নমানের ছিল; সাধারণ লেখালেখি ও স্বাক্ষরতা পর্যন্তই। সেসময় আফগানিস্তানের আমিনুল ইত্তিলাআত (সিআইডি-প্রধান) ফারসি ভাষার ব্যাকরণের সাথেও পরিচিত ছিলেন না। তিনি জাফর হাসান আইবেকের কাছ থেকে প্রাথমিক ইংরেজি পাঠগ্রহণ করেন। জাফর হাসান জানান :

'অন্ধসমাজে কানা রাজা' সে-সময়কার আফগানিস্তানের জনগণ এবং তাদের শাসকশ্রেণি এই প্রবাদের উদাহরণ ছিল। জনগণ ছিল অশিক্ষিত এবং পশ্চাদপদ। সে সময় যে একটু লিখতে-পড়তে পারত সেই হয়ে যেত হর্তাকর্তা। সরকারে অযোগ্য লোকজনও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কেউ জিজ্ঞাসা করত না কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে তারা বড় পদে পৌঁছেছেন, এমনকি বর্তমান আফগানিস্তানে এখনও স্নাতক (Graduate) এবং ডিগ্রিপ্রাপ্ত উচ্চতর কর্মকর্তা খুব কমই আছেন।[২]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই 'আত্ম-বেষ্টন' উঠে যায় এবং তারাও পশ্চিমা সভ্যতা ও জীবনব্যবস্থা (সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ) মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এখন অন্ধভাবে পশ্চিমা সভ্যতা ও সমাজকে গ্রহণ করে চলছে। ৩২ বছরের এই সময়ে সেখানে এমন বিপ্লব ঘটে গেছে যে, যেসব ব্যবস্থা আফগান-সমাজ সহ্য করতে পারেনি এবং যার দায়ে আমির আমানুল্লাহ খানকে তার বংশীয় সিংহাসন ও মুকুট ছেড়ে দিতে হয়েছিল, আজ আফগানিস্তান সেসবই সাদরে গ্রহণ করে নিচ্ছে। এই মহাবিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান থেকে অনুমান করা যায়।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার ইউরোপীয় প্রতিবেদক, যিনি ১৯৬৩ সালের আফগান স্বাধীনতা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন, সংবাদপত্রটির ২৮ জুলাই, ১৯৬৩ সালের প্রকাশিত সংখ্যায় তিনি লিখেছেন :

এত বিস্তৃত পরিসরে ফুটতে থাকা আতশবাজির প্রদর্শনী (যা আমি আফগানিস্তানে আগে কখনো দেখিনি) এর সাথে অর্ধমিলিয়ন দর্শকের উচ্ছ্বাস ও করতালির কলরোল উচ্চারিত হচ্ছিল। এভাবে আফগানিস্তান তার স্বাধীনতা উৎসব পালন করছিল। আমাকে আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী—যিনি আমাদের সাথে ঝিলের ধারে রাজকীয় আসনে বসে ছিলেন এবং যেখানে একটানা আতশবাজি ফুটছিল—বললেন, আপনি ভুল সময়ে এসেছেন, আমরা এই সময় মজা করছি এবং এই মুহূর্তে আমরা আমাদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা করছি না।' আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, তা নয়, এটাই বরং সর্বোত্তম সুযোগ। একটি দেশের কৃতিত্বের মূল্যায়ন ভালোভাবে তখনই করা যায়, যখন এর অধিবাসীরা

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

আনন্দ-উৎসবে মত্ত থাকে। আমি তো আফগান নারীদের হাস্যরত অবস্থায় দেখতে চাই। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সুন্দরী ললনা হাসিমুখে আমাদের দলে যোগ দেয়। এই এক জিনিসই বিদ্যুৎ-উজ্জ্বল কাবুল, এখানকার সমস্ত আধুনিক ভবন, নতুন শিল্প-উপকরণ ও সকল বস্তুগত উন্নয়ন অপেক্ষা আফগানিস্তানের পরিবর্তনকে বেশি প্রতিফলিত করে!

তিন বছর আগেও এখানকার নারীরা হিজাব পরতেন। তখন যদি তাকে এমন উপলক্ষে বের হবার অনুমতি দেওয়াও হত, তাকে এমন চাদরে আবৃত হয়ে আসতে হত, যা আপাদমস্তক তাকে ঢেকে রাখত এবং নিকাব তার চেহারাকে আবৃত করে রাখত, দেখার জন্য যাতে থাকত দুটি ছিদ্র। এখন এ-সবই পরিবর্তনের বন্যাস্রোতে ভেসে গেছে। অবশ্য আমি এখনও মিশনে এমন মহিলাদের দেখতে পাই, যারা এখনও ঢিলেঢালা বোরকা পরে। তারা এখনও চেহারা খোলা রাখার যে স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাতে অভ্যস্ত হতে পারেনি; কিন্তু নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটা বে-নেকাব হয়ে গেছে। এই বিপ্লব আফগানিস্তানের নারীদের উপর কতটা গভীর প্রভাব ফেলেছে তা আফগানিস্তানের বাইরের লোকেদের জন্য কল্পনা করা কঠিন। ৩২ বছর পূর্বে মোল্লারা শাহ আমানুল্লাহ খানকে এজন্য সিংহাসন থেকে বহিষ্কার করেছিলেন যে, তিনি তার রানি সাহেবাকে নেকাব ছাড়া বাইরে বের হবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এটা দাবি করা ঠিক হবে যে, পর্দা থেকে আফগান নারীদের 'মুক্তি' পেডিয়াট্রিক মেডিকেল সেন্টারের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যখন ডা. আন্না মারিয়া গেড আজ থেকে দশ বছর আগে ডেনমার্ক থেকে আফগানিস্তানে এসেছিলেন। সেই সময়ে আফগানিস্তানে সন্তানপ্রসব করাবার জন্য মহিলা ডাক্তার একজনও ছিল না। পুরো আফগানিস্তানে সেই সময়ে মাত্র একশ ডাক্তার ছিল, এবং তারা ছিল সবাই পুরুষ। কোনো পুরুষ ডাক্তারের মহিলাদের পরীক্ষা করার অনুমতি ছিল না। স্থানীয় ধাত্রীরা আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিল। ডাক্তার গেড ধাত্রী মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে রাজপরিবারের নারীগণও শামিল ছিলেন। মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং অনেক বোরকা পরা মহিলা সেখানে আসতে শুরু করে। সেখানে তারা শুধু শারীরিক সুবিধাই লাভ করেনি, পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও; বরং লেডি ডাক্তার এবং নার্সদের সাথে সাক্ষাৎ-সান্নিধ্যের পর তারাও জানতে পারে যে, মহিলারাও (এই পেশায়) পুরুষদের মতো জীবিকা উপার্জন করতে পারে, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই অসুস্থ মহিলারা চিকিৎসালয়ে বুঝতে পেরেছিল তাদের মর্যাদা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অতএব, লুকোনো গৃহ-আসবাবের মতো তারা গণ্য হতে পারেন না। আজ নারীদের জন্য উচ্চমানের হাসপাতাল রয়েছে। সেখানে উচ্চপদস্থ নারীকর্মীরা দায়িত্বে রয়েছেন, যারা পরিচ্ছন্নতা-নীতি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন এবং ডা. গেডের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যগুলো প্রতিষ্ঠা করেন।

আফগানিস্তানে নারীরা ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাস থেকে বে-নেকাবি শুরু করেছে। কোনো রাজকীয় ডিক্রি নারীদের বোরকা থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দেয়নি বটে; কিন্তু অনুমোদন দিয়েছে। আমি কাবুল ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্র্যাজুয়েট মাসুমা কাজেমিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি এই ডিক্রি জারির পরে কী করেছিলেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার বোন এবং আমি আমাদের বোরকার চাদরগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম এবং শপথ করেছিলাম আর কখনোই বোরকা ব্যবহার করব না। মাসুমা এবং তার বোন ফিরোজা একজন ব্যাঙ্কারের মেয়ে এবং তারা উভয়ই ১৯৬৫ সালে শিক্ষাসমাপন করে লেডি ডাক্তার হবেন। ১৯৬৪

সালে, মহিলা ডাক্তারদের প্রথম দল, সাত বছরের মেডিক্যাল কোর্স শেষ করার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবেন। আজ, আফগানিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চলছে, যেখানে ইতিপূর্বে ছাত্রীরা চাদর পরে আসতে এবং ছাত্রদের থেকে পৃথকভাবে পড়াশোনা করতে অভ্যস্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিনাবেতনে চলছে। শিক্ষার্থীদের বেতন, বইপুস্তক, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাবার—য়োজনীয় সবই সরকার ব্যবস্থা করেন। অনেক মেয়ে অচিরেই ডিগ্রি অর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার নিযুক্ত হবে। সে সময় নারী এবং পুরুষ টিচারের খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে শিক্ষা অনেকটা বিদেশি শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল ছিল।[১]

১৯৭৩ সালে আমার আফগানিস্তান গমন এবং সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয়। তখন এই ভ্রমণবৃত্তান্ত—দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক—গ্রন্থে কিছু আধুনিকতাবাদী আফগান নারীর কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিব্যক্তিটি লিপিবদ্ধ করি :

আমরা এটা উপলব্ধি না করে পারিনি যে, আফগানিস্তানে পশ্চিমা সভ্যতা বহুদূর এগিয়েছে এবং এর প্রভাবও প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে। ১৯২৮ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যকার একটি বিস্তৃত ব্যবধান বাধা হয়ে রয়েছে। আমির আমানুল্লাহ খানের আমল পর্যন্ত আফগান জাতি ইসলামি আফগানী ঐতিহ্যে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকৃত ছিল। এর তীব্রতা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল এবং এরই ফলে আমির আমানুল্লাহ খানের কিছু প্রাচীন ইসলামি ঐতিহ্যের বিরোধিতার কারণে তার বিরুদ্ধে হাঙ্গামা শুরু হয় এবং তাকে সিংহাসন ছাড়তে হয়; কিন্তু এখন পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। আফগান জাতি তার অতীত থেকে অনেকদূরে সরে গিয়েছে। এই দূরত্ব মাস-বছরের বিচারে অনেক স্বল্প হলেও, চিন্তা ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় অনেক দীর্ঘ। অধিকাংশ জাতি এতটা দূরত্ব বহু শতাব্দীর ব্যবধানে অতিক্রম করে। পর্দা এখন পশ্চাদপদতা, অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই কারণে এটি দেহাতি ও গাঁও-গেরামের কিছু দীনদার আলেম এবং রাজধানী থেকে বহুদূরে বসবাসরত কৃষকের ঘরে সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে গেছে...; তবে আলেমসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া ব্যবধান ঢের প্রশস্ত হয়ে গেছে, যা দূর করা সহজ নয়।[২]

আমার ভ্রমণসঙ্গী শেখ আহমদ মুহাম্মদ জামাল কাবুলে একটি মহিলা সভায় অংশগ্রহণ করেন, আমি তখন গজনীতে ছিলাম, তাই উপস্থিত হতে পারিনি। পরে জানানো হল যে, পর্দা, পুরুষদের তালাকের অধিকার এবং বহুবিবাহের ইস্যু নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে, যা দ্বারা অনুমান করা যায় যে আফগান নারীরা কেমন চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং বিদেশি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রোপাগান্ডা এবং এর প্রভাব কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে।[৩]

১৯৭৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ সরদার দাউদ খানকে উৎখাত করা হয় এবং সেনাবাহিনীর সংক্ষিপ্ত গৃহযুদ্ধ এবং জনগণের উপর জবরদস্তির পরে সেনাবাহিনীর কমিউনিস্ট অংশ কর্তৃত্ব দখল করে নেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে

[১] টাইমস অব ইন্ডিয়া, ২৮ জুলাই ১৯৬৩

[২] দরিয়ায়ে কাবুল সে দরিয়ায়ে ইয়ারমুক তক, পৃ. ৩১-৩২

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে। ওলামা এবং দীনদার যুবকদের গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যা ও নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এই নৃশংসতার ফলে, তদুপরি আফগান জনগণের ধর্মীয় মেজাজ এবং দীনি আত্মমর্যাদাবোধের কারণে কমিউনিস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ শুরু হয়। রাশিয়াকে দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করে নতুন শাসক বসাতে হয়েছিল এবং যখন তাও কার্যকর হয়নি, তখন প্রকাশ্য সামরিক অভিযান চালিয়ে সরাসরি দেশটি দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হয়, যে পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ নিন্দা জানিয়েছে এবং এটাকে নগ্ন আগ্রাসন এবং সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বিবেচনা করা হয়েছে, যখন একটি বৃহৎ দেশ অন্য একটি ছোট দেশকে সেনাভিযান ও বলপ্রয়োগ করে দখল করে গোলাম বানিয়ে রাখে।

এই পদক্ষেপটি, বিগত বছরগুলিতে যা কখনো দেখা যায়নি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি নৈতিক প্রতিবাদের বৈশ্বিক সর্বজনীন অবস্থা তৈরি করেছিল এবং কমিউনিজমের মানবীয় সাম্য ও নিপীড়িতের সমর্থন-সাহায্যের গালভরা দাবি জোরালোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল এবং ক্ষুদ্র শান্তিপ্রিয় এবং আত্মনির্ভরশীল দেশগুলিকে, যারা তাদের বিশ্বাস ও জীবনধারা নিয়ে থাকতে চায়, সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ করে তোলে।

এমনটাই ইয়েমেন এবং সেইসব দেশের ভবিতব্য হয়েছে, যারা দীর্ঘদিন যাবত প্রতিটি নতুন ও দরকারি জ্ঞান, অ-ক্ষতিকর উপকরণ, নতুন সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা, কল্যাণমূলক পদক্ষেপ এবং সামরিক স্থিতিশীলতা- সবকিছু তাদের সীমানার মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। অন্তত ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত, ইয়েমেনের যে চিত্র, অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগ এবং সময়ের সাথে সাথে এর অগ্রযাত্রা, তার কিছুটা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে, যা মিসরের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'রোজ আল-ইউসুফ'র আরববিষয়ক প্রধানসম্পাদক মামদুহ রেজা কর্তৃক ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-উমারি থেকে গৃহীত সাক্ষাৎকারে পাওয়া যায়, যেটি ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় :

> ১৯৫৫ পর্যন্ত ইয়েমেনে নিয়মতান্ত্রিক কোনো আদমশুমারি ছিল না। আয়ের একমাত্র উৎস ছিল কর ও শুল্ক রাজস্ব। কৃষিই ছিল ইয়েমেনের মানুষের জীবিকার একক উৎস। সেচের উপায় ছিল বৃষ্টির পানি এবং কূপ। বাৎসরিক বাজেট মাত্র দেড় কোটি পাউন্ড, দেশের রক্ষিত সম্পদ ইয়েমেনের ইমামের ব্যক্তিগত সম্পদ (৮ কোটি পাউন্ড) ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশে সাধারণত কোনো রাস্তা ছিল না, মুখা এবং তাইজ দুই শহরের মধ্যে মাত্র ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মিত হয়েছিল, যা '৫৫ সাল পর্যন্ত কাঁচা ছিল। গবাদিপশু ছিল পরিবহণের একমাত্র মাধ্যম। দেশে মাত্র কয়েকটি গাড়ি ছিল। কোনো সামরিক বিমান ছিল না। মাত্র ১১টি বিমান ছিল। দেশে কোনো হোটেল বা রেস্টুরেন্ট ছিল না। কোনো কারখানা ছিল না। কোনো পুলিশ ফোর্স ছিল না।
>
> সরকার কয়লা ও পেট্রোল উত্তোলনের জন্য কয়েকটি ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছিল। দেশের এই পশ্চাদপদতা, পার্শ্ববর্তী বিশ্বের অবস্থা এবং প্রতিবেশী দেশগুলির উন্নয়নের চাপ সরকারকে কিছু সংস্কার ও উন্নয়ন করতে বাধ্য করেছিল। এক্ষেত্রে একমাত্র